بنگالی

THE QUESTIONS PERTAINING TO HUMAN LIFE

By

Muhammad Ashrafuddin Khan.

জীবন জিজ্ঞাসা

মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন খান

প্রত্যয় প্রকাশনী
৬/১২ ব্লক-এ-লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

জীবন জিজ্ঞাসা
মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন খান

প্রকাশকালঃ

প্রথম সংস্করণ ঃ বাংলা- ১৯ শে বৈশাখ, ১৩৯৮
আরবী- ১৭ শাওয়াল, ১৪১১ হিঃ
ইংরেজী- ৩ মে ১৯৯১

প্রকাশকঃ

জহির উদ্দিন মাহমুদ
প্রত্যয় প্রকাশনী
৬/১২ ব্লক-এ-লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদঃ আরিফুর রহমান

মুদ্রণঃ

চৌকস
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা ১০০০। ফোন ঃ ৪১৪৩৯৩

পরিবেশকঃ

আল-এছহাক প্রকাশনী
২/৩, প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্যঃ

আট টাকা

JIBON JIGWASHA

Jibon Jigwasha written in Bengali by Mohammad Ashrafuddin. Published by Zahiruddin Mahmud, 6/12 Block-A-Lalmatia, Dhaka-1207, Sponsored by Prottoy Prokasoni.

উৎসর্গ

সত্যান্বেষী অকুতোভয়

তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে

এ বইতে যা আছে

- জীবন জিজ্ঞাসা ৭
- দু'টো মৌলিক জিজ্ঞাসা ৭
- মানুষ কি প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল? ৮
- অস্তিত্বের প্রকারভেদ ৯
- স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ১০
- নির্ভরশীল অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ১০
- স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের অপরিহার্যতা সম্পর্কে দু'টো প্রমাণ ১০
- সৃষ্টির শৃংখলাগত প্রমাণ ১১
- আল্লাহর একত্ব ১২
- আল্লাহর কয়েকটি বিশেষ গুণাবলী ১৩
- বুদ্ধিবৃত্তিপ্রসূত ভালমন্দের ধারণা ১৬
- মানবপ্রবৃত্তি ১৭
- দয়া বা অনুগ্রহ ১৭
- নবী ১৮
- নবী পাঠানোর উদ্দেশ্য ১৮
- নবীগণের দায়িত্ব কি ছিল ১৯
- তাক্‌দির (ভাগ্য) ১৯
- তাক্‌দিরের সঠিক ব্যাখ্যা ২৩
- আল্লাহর বিশেষ হস্তক্ষেপ ২৫

মুখবন্ধ

জন্মের পর থেকে চিন্তার বিকাশের মাধ্যমে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে। স্থান–কাল ও ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের মনে অবচেতনভাবে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। জীবন জিজ্ঞাসার এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে উদ্ভব হয়েছে অসংখ্য বাদ–মতবাদের। সুস্থ ও বিকৃত চিন্তাধারার গোলকধাঁধায় মানব সন্তান যেন চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলছে।

সৃষ্টিকর্তা নির্দেশিত সুষম বন্টন ও ভারসাম্যের নীতিকে উপেক্ষা করে প্রকৃতিবিরোধী বিভিন্ন মতবাদ সমাজদেহকে আচ্ছন্ন করে আছে। অতৃপ্ত ভোগলিপ্সাকে চরিতার্থ করার মানসে একশ্রেণীর মানুষ পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিগড়ে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে শোষণের যাতাকলে নিষ্পেষণ করছে। নিত্যনুতন রূপে বল্গাহীন স্বাধীনতার মরীচিকা বিশ্বমানবতাকে নিয়ে চলছে হতাশার গভীর অমানিশার পানে। মানব জগতের এই দুর্যোগ মুহূর্তে মানবতার মুক্তির দাবী নিয়ে এগিয়ে এল নাস্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজবাদ তথা সাম্যবাদ। সর্বহারাদের মুক্তির নামে মানবতাকে নব্য শৃংখলে বন্দী করল। মানবজাতি এতে দেখতে পেল আত্মার বন্দীদশা। তাই সত্তর বছর পর এর পরিণতি হল পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসের যাদুঘরে চির বন্দীত্ববরণ।

চিন্তা ও মতবাদের এসব সীমাবদ্ধতা যুবমানসকে করে তুলেছে বিদ্রোহী। সে আজ আর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রংগীন চশমা দিয়ে জীবন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজে না। তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আজ সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। হতাশার আঁধার কাটিয়ে চিরন্তন সত্যানুভূতিতে অধীর হয়ে সে পথ খুঁজছে। সত্যদর্শনের তথাকথিত ধারক–বাহকদের বিকৃত উপস্থাপনাই যে যুব সমাজকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অসার মতবাদের অক্টোপাশে আবদ্ধ করে ফেলেছিল তা আজ আর কারও অজানা নয়।

চিরন্তন সেই শাশ্বত সত্যকে যুযোপযোগী করে নতুন আঙ্গিকে তরুণ বন্ধুদের কাছে উপস্থাপনের মানসিকতা নিয়েই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। জীবন দর্শনের এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা চিন্তার দিগন্তকে প্রসারিত করুক এ কামনাই করছি।

পুস্তিকাটি লিখতে গিয়ে সার্বিকভাবে যার আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি তিনি হলেন–তরুণ সমাজকর্মী জহির উদ্দিন মাহমুদ। এ ছাড়াও যে দু'জন সম্মানিত ব্যক্তি ভাষা ও আঙ্গিকের ব্যাপারে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, তাঁরা হলেন জনাব অধ্যাপক সিরাজুল হক ও সাপ্তাহিক বিক্রমের সহকারী সম্পাদক জনাব ফরিদ আহমদ রেজা। এ ছাড়াও বইটি রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে আরও যাদের সহযোগিতা পেয়েছি আমি তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে চিন্তার স্বচ্ছ–বিকাশে এ প্রয়াস যদি এতটুকু সহায়ক হয় তবে আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন খান

জীবন জিজ্ঞাসা

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ জ্ঞান অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করেছে। জ্ঞান পিপাসায় তৃষ্ণার্ত হয়েই এ পথে তার যাত্রা শুরু। সে যাত্রা কখনও থেমে থাকেনি। অজনাকে জানা আর অচেনাকে চেনার এ প্রয়াস মানুষের সহজাত। এ প্রচেষ্টায় সফলতার জন্য প্রয়োজন চিন্তার সঠিক ও পূর্ণ বিকাশ। আর তাহলেই সে চূড়ান্ত সত্যে উপনীত হতে পারবে।

দর্শন সকল জ্ঞানের মূল হিসেবে বিবেচিত। আর দর্শন শাস্ত্র হল এমন একটি বিষয় যা জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা ও এর বিকাশ নিয়ে আলোচনা করে। মানুষ চিন্তা ভাবনা করে কাজ করতে চায়। সে স্বতঃই চিন্তাশীল। মানুষ ও পশুর মাঝে পার্থক্য এখানেই। এজন্যই মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। চিন্তাভাবনা করে সে ভালমন্দের সংমিশ্রণ থেকে ভালটা খুঁজে নেয়। আর মানুষের এই চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভংগী নিয়েই দর্শনশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। তাই বলা যায় জ্ঞান হিসেবে দর্শনই সেরা। দর্শন হচ্ছে একটি মৌলিক শাস্ত্র যা চিরন্তন। অর্থাৎ প্রকৃত দর্শন পরিবর্তনশীল নয়। অন্যদিকে প্রচলিত বিজ্ঞানের জ্ঞান হ'ল আপেক্ষিক যা অনেকাংশেই হাইপোথিসিস (Hypothesis) বা প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

মানুষ যখন বুঝতে শিখে তারপর থেকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তার মনে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উদয় হতে থাকে। সে ভাবে–সে কে, কি তার পরিচয়? কোথায় তার উৎস আর গন্তব্যস্থলই বা কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

দু'টো মৌলিক জিজ্ঞাসা

প্রথমত ঃ মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন, পৃথিবীতে কেন এত অবিচার–অনাচার, শোষণ–নিপীড়ন! কেনই বা জাতিতে জাতিতে, ভাষায় ও বর্ণে এত বৈষম্য ও বিবাদ! বিকশিত চিন্তার মাধ্যমে এর জবাব পাওয়া সম্ভব। আর তা'হলেই প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে, মানুষ পাবে সঠিক পথের সন্ধান। মানুষের চিন্তার স্বাভাবিক দাবি হ'ল, এই অন্যায়–অবিচারের একটি প্রতিকার হওয়া দরকার। এটাকে মেনে নেয়া যায়না। মানব প্রকৃতি তা মেনে নিতে পারে না। এর স্বাভাবিক পরিণতিতেই যুগে যুগে বিভিন্ন মুক্তি আন্দোলন জন্ম নিয়েছে, উদ্ভব হয়েছে মানবতাবাদী নেতৃত্বের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, মানুষ কি পৃথিবীতে ন্যায়–অন্যায়ের সঠিক প্রতিবিধান করতে পারে? বিবেকের

দাবি হ'ল এমন এক সত্তা থাকতে হবে যিনি একদিন মানুষের এই ন্যায়-অন্যায়ের হিসেব মিলিয়ে দেবেন। সে দিনটিই হবে প্রতিদান দিবস। এই প্রতিদান দিবসের যিনি মালিক হবেন তিনি হবেন অসীম শক্তিশালী। এর পাশাপাশি তিনি হবেন ন্যায়বিচারক, দোষত্রুটিমুক্ত এবং ভারসাম্যপূর্ণ নীতির অধিকারী। তা না হলে তাঁর পক্ষে মানবজাতির দেনাপাওনা মিটিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ প্রকৃতিগত চাহিদা অনুযায়ী পৃথিবীতে শান্তি ও শৃংখলা কামনা করে। যুদ্ধবিগ্রহ মানুষের প্রকৃতি বিরোধী। সীমালংঘন, অনধিকার চর্চা প্রভৃতি মানুষের বিবেকের পরিপন্থী। তাই মানুষ সদ্ভাব ও স্থিতিশীলতা চায়। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল সমাজে শান্তি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব? সমাধান একটিই-আর তা হ'ল নিজ স্বার্থের চেয়ে অন্যের ও সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে বড় করে দেখা। কিন্তু অন্যের জন্য নিজের স্বার্থ বিলিয়ে দেয়ার এ মানসিকতা কিভাবে সৃষ্টি হবে? কিভাবেই বা মানুষের পারস্পরিক বুঝাপড়া এবং আদানপ্রদানে শৃংখলা ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা সম্ভব? কিভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা, বন্ধ হবে অন্যায় অবিচার ও শোষন-নিপীড়ন?

এটা তখনই সম্ভব যখন সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে যে, সবকিছুর অন্তরালে এমন এক সত্তা আছেন যিনি তার ত্যাগ ও কোরবানীর মূল্যায়ন করবেন এবং একদিন না একদিন তার সকল কাজের প্রতিদান দেবেন।

এ প্রসংগে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, "তোমরা কি মনে কর যে আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ, যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই; সম্মানিত আরশের তিনি অধিপতি।"

– (সূরা মুমেনুন, ১১৫-১১৬)

"অনন্তর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে। এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে, সেও তা প্রত্যক্ষ করবে।"

– (সূরা যিল্যাল, ৭-৮)

এভাবেই মহান আল্লাহ শান্তি শৃংখলাময় ও স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মানুষ কি প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল?

ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দেখা যায়, সর্বকালে সকল সমাজের অধিকাংশ মানুষই বুঝে-না বুঝে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বা অবচেতন মনে বিভিন্নরূপে নিজেকে কোন না কোন শক্তির মুখাপেক্ষী মনে করেছে, নিজের দুর্বলতা অনুভব করে

শক্তিশালী কোন সত্তার অন্বেষণ করেছে। যদিও প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাকে খুব কম লোকই চিনতে পেরেছে। কখনও তারা গাছ, পাথর, মূর্তি, সূর্য ইত্যাদির পূজা–অর্চনা করেছে। আবার কখনো ঐশী বার্তাবাহকের মাধ্যমে প্রকৃত স্রষ্টার সন্ধান পেয়েছে। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, সৃষ্টিকর্তায় আত্মসমর্পণের এই প্রবণতা মানব মনের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

এরই বাস্তব প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই, এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নাস্তিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ সাম্যবাদের ভিত্তিতে মানব–সমস্যার সমাধান ও সমাজ গঠনের যে প্রয়াস চালান হয়েছিল মাত্র সত্তর বছরের ব্যবধানে এসেই তা মানব সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছে। সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী এ মতবাদটি মানুষের প্রকৃতি (ফিত্‌রাত) বিরোধী। অন্যদিকে পুঁজিবাদ টিকে আছে আস্তিকতার বেড়াজালে ধর্মকে ব্যবহার করে। এভাবেই পুঁজিবাদ শাসন–শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদের ধারকরা সরাসরি মানুষের প্রকৃতির (সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস) বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়নি। বরং বাইবেল ছুয়ে তারা শপথ গ্রহণ করে থাকে।

একব্যক্তি ইমাম জাফর সাদিকের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, আমি আল্লাহকে কিভাবে জানতে পারব? ইমাম জবাবে বললেন, গভীর সমুদ্রে ঝড়ের মধ্যে নৌকাডুবির মুখে কখনো পড়েছ কি? সে ব্যক্তি সম্মতিসূচক জবাব দিলেন। অতঃপর তিনি জানতে চাইলেন, ঐ সীমাহীন হতাশার মাঝেও কি তোমার অন্তরে এ আশার আলোক ঝলকে উঠেনি যে, অজানা একশক্তি তখনও তোমাকে রক্ষা করতে পারে? হ্যাঁ, এমন হয়েছিল। লোকটি একমত হলেন। ইমাম বললেন, ঐ শক্তিই মহান আল্লাহ।

অস্তিত্বের প্রকারভেদ

সাধারণতঃ অস্তিত্বশীল কোন জিনিস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। আবার অস্তিত্বে বিরাজমান অনেক জিনিস আমরা দেখতে পাইনা। এমনিভাবে অনেককিছুর অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি আবার অনেককিছুরই অস্তিত্ব অনুভব করি না। অস্তিত্ব দু'রকম হ'তে পারে।

১. স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (ওয়াজিবুল উজুদ) ঃ

এটা এমন এক অস্তিত্ব যা অন্য কারো উপর নির্ভরশীল নয় এবং যাকে কেউ অস্তিত্বে আনেনি বরং যা নিজের কারণেই নিজের অস্তিত্বে বর্তমান।

২. নির্ভরশীল অস্তিত্ব (মুমকিনুল উজুদ)ঃ

এটা এমন এক অস্তিত্ব যা পরাধীন ও মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ যা নিজের কারণে অস্তিত্বশীল নয় বরং অন্যের কারণে অস্তিত্বশীল।

এর বাইরে আরো কিছু অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করতে পারি বাস্তবে যাদের অস্তিত্ব

নেই। কিন্তু কাল্পনিকভাবে এদের অস্তিত্ব আছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এটা অসম্ভব অস্তিত্ব, যা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের স্বতসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) অন্যের কারণে অস্তিত্বশীল নয়, বরং নিজের কারণেই নিজে অস্তিত্বশীল।

(২) তার 'অস্তিত্ব' ও তার 'স্বাধীন অস্তিত্ব' এ দু'টো দিক আলাদা কিছু নয়, বরং দু'টো মিলে একই সত্তা।

(৩) এই অস্তিত্বটি একক, অবিচ্ছিন্ন, মৌলিক। কোন যৌগ বা মিশ্রণ নয়।

(৪) এটা কোন কিছুর অংশ নয়, বরং নিজেই সম্পূর্ণ।

(৫) এই অস্তিত্ব একের অধিক হবে না। কেননা একাধিক শক্তি কখনোই পাশাপাশি সর্বোচ্চ হ'তে পারে না।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে–"আকাশ ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া আরো ইলাহ্ থাকতো তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। কাজেই আরশের মালিক আল্লাহ্– পবিত্র সে সকল কথা হ'তে যা তারা তাঁর উপর আরোপ করে থাকে।"

– (সূরা আম্বিয়া, ২২)

নির্ভরশীল অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) এই অস্তিত্ব সবসময়ই কোন ক্রিয়ার ফলাফল (EFFECT), অর্থাৎ কোন কারণের (CAUSE) উপর নির্ভরশীল।

(২) যতক্ষণ পর্যন্ত অস্তিত্বে আছে, ততক্ষণই কারণের উপর নির্ভরশীল, এক মুহূর্তও কারণ ছাড়া স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল নয়।

(৩) এই অস্তিত্বের অস্তিত্বে থাকা বা না থাকার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, কেননা তা নির্ভরশীল অস্তিত্ব।

স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের অপরিহার্যতা

দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান সকল বস্তু অপর কোন বস্তু বা শক্তির উপর নির্ভরশীল। কেননা–

(ক) যদি আমরা একটি টেবিলের অস্তিত্বকে কল্পনা করি এবং এর নির্মাতাকে খুঁজি, তাহলে প্রাথমিকভাবে চারা রোপণকারী, কাঠ চেরাইকারী বা কারিগর প্রমুখ সংশ্লিষ্টদের সন্ধান পাই। অতঃপর তাদের মূলে দেখা যায় তাদের পিতামাতাকে, এভাবে অগ্রসর হয়ে পরিশেষে হযরত আদম (আঃ) বা আদি মানবে এসে ঠেকবে।

কিন্তু এখন যদি প্রশ্ন করা হয় আদিমানবের স্রষ্টা কে? এবং উত্তর যদি হয়–'প্রকৃতি' তাহলে আবার প্রশ্ন আসে 'প্রকৃতি'র স্রষ্টা কে এবং এক্ষেত্রে যদি উত্তর হয়– 'আদিমানব' তাহলে এটি একটি চক্রে পরিণত হয়। আর যে কেউই বলবেন যে চক্রের এ ধারণাটি সঠিক নয়।

(খ) পক্ষান্তরে 'আদিমানবের স্রষ্টা কে?' এই প্রশ্নের উত্তর যদি হয় 'অন্য কেউ', আবার এই 'অন্য কেউ'র স্রষ্টা কে? এর উত্তর যদি হয় 'অন্য কেউ', এবং এভাবে যদি ধারাবাহিকভাবে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে এবং কোথাও গিয়ে শেষ না হয় তাহলে এটাও সঠিক হিসেবে বিবেচিত হবে না। কেননা কোথাও না কোথাও গিয়ে এর শেষ হতেই হবে।

সুতরাং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি (আক্‌ল্‌) খুব স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা করতে সক্ষম যে, প্রতিটা ফলাফলের পেছনেই একটি কারণ বর্তমান। আর সামগ্রিকভাবে সব কারণেরই একটি মহাকারণ থাকবে এবং তা চূড়ান্তভাবে এক মহাশক্তিতে গিয়ে শেষ হবে, সেটিই স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (ওয়াজিবুল উজুদ) তিনিই সর্বশক্তিমান ও ভারাসাম্য বিধানকারী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। হযরত ইমাম জাফর সাদিককে জিজ্ঞাসা করা হয়, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ কি? তিনি জবাব দেন "আমার অস্তিত্বের উৎপত্তি যদি আমা থেকেই হয়ে থাকে তা'হলে এখানে দু'টি সম্ভাবনার কথা আসে। হয় আমি অস্তিত্বে আসার পর নিজেকে সৃষ্টি করেছি, যা হচ্ছে ইতোমধ্যেই অর্জিত জিনিসকে অর্জনের প্রচেষ্টা; নতুবা নিজে সৃষ্ট হওয়ার আগেই আমি নিজেকে সৃষ্টি করে রেখেছি, যা অসম্ভব। কারণ অনস্তিত্ব কি করে অস্তিত্বের উদ্ভব ঘটাতে পারে? কাজেই আমি অন্য এমন কারও দ্বারা সৃষ্ট হয়েছি, যিনি চির অস্তিত্বমান এবং চিরন্তন। আর তিনিই মহান আল্লাহ?"

সৃষ্টির শৃংখলাগত প্রমাণ (বোরহানে নাজম্‌)

সৃষ্টির সকল ক্ষেত্রে সুষম একটি বিন্যাস ও নিখুঁত গঠন এবং সর্বোপরি এর ভারসাম্য দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে কে এর নির্মাতা ও পরিচালক?

ক্ষুদ্র পরমাণু থেকে সুবৃহৎ ছায়াপথ পর্যন্ত সকল সৃষ্ট বস্তুই পরস্পরের সাথে পূর্ণ ভারাসাম্য রেখে চলছে। কোথাও কোন ফাঁক নেই। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ থেকে জড়পদার্থের নিজস্ব কোন গতি নেই। আবার পদার্থবিদ নিউটনের গতিসূত্র অনুসারে কোন স্থির বস্তু বাইরের কোন শক্তির সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত চিরকাল স্থিরই থাকে। এখন উপরোক্ত তথ্য অনুসারে সকল জড়পদার্থেরই স্থির থাকার কথা। অথচ বিজ্ঞানীদের মতে সুবিশাল এই মহাশূন্যে রয়েছে সচল নক্ষত্রমণ্ডলী, আরো রয়েছে প্রচণ্ডবেগে সঞ্চরণশীল গ্রহমালা। তাহলে প্রশ্ন জাগে সুবিশাল এই তারকারাশির

দেখা দেয়। আর তাতে সৃষ্টি হয় বিশৃংখলা। অথচ মানুষ যদি আল্লাহ প্রদত্ত বিধি বিধানকে ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতো তাহলে পৃথিবীর এই সাময়িক জীবনেও নেমে আসতো শান্তি। মানুষ তার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমিত স্বাধীনতা ভোগ করে। এক্ষেত্রে সে পরীক্ষাধীন। জীবনের কোন এক পর্যায়ে অথবা পরকালে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দিয়ে সমাজের সাময়িক অন্যায়-অবিচারের একটা চূড়ান্ত সুরাহা করবেন, অর্থাৎ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব (ওয়াজিবুল উজুদ) মহানিয়ন্ত্রক আল্লাহ যদি অন্যায়ের শাস্তি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্য পুরস্কার না দেন, তাহলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা স্বাধীন অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব সমগ্র সৃষ্টিজগতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন আর মানুষের পারস্পরিক লেনদেনের ব্যাপারেও ভারসাম্য কায়েম করবেন এটাই বিবেকের দাবি। তাই আমরা বলতে পারি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যেমনি হাকিম তেমনি ন্যায়বিচারক (আদেল)ও বটে।

এছাড়া প্রতিটি বিবেকবান মানুষই (তিনি যে ধর্মের বা আদর্শেরই হোন না কেন) একমত হবেন যে, যে আল্লাহ ভালকাজের পুরস্কার ও মন্দকাজের শাস্তি দেবেন, তিনি স্বয়ং কোনক্রমেই মন্দকাজ করতে পারেন না, বা কারও উপর জুলুম করতে পারেন না। কেননা সেক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের সীমা নির্ধারণ স্ববিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"

– (সূরা নাহ্‌ল, ৯০)।

"সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

– (সূরা আনআম, ১১৫)

"এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করব না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।"

– (সূরা তূর, ২১)

সুতরাং, মহান আল্লাহ যা খুশী তা-ই করেন না। বরং তিনি ন্যায়বিচারক।

মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞানী

আমরা স্থান ও কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ বলে 'অতীত', 'বর্তমান', 'ভবিষ্যত', – এ সকল পরিভাষা ব্যবহার করি। কিন্তু মহান আল্লাহ সময়ের উর্ধ্বে এবং সমগ্র

সৃষ্টিজগত পরিবেষ্টন করে আছেন। তাই তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত বলে কিছু নেই। আর সকল সময় সর্বত্র বিরাজমান বলে কোন কিছুই তাঁর কাছে লুকায়িত নেই। অপরদিকে যেহেতু আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা তাই সবকিছু সম্পর্কেই তিনি জানেন। মহাকাশ ও ছায়াপথে অস্তিত্বমান হওয়ার পথে রয়েছে এমন গ্রহ এবং ইতোমধ্যে নিশ্চল, গতিহীন হয়ে যাওয়া গ্রহ ইত্যাদি সকল স্থানে কি ঘটছে সবকিছু সম্পর্কেই তিনি জ্ঞাত। এই বিশাল জগতে কোটি কোটি বছর আগে কি ঘটেছে এবং পরে কি ঘটবে সবই তিনি জানেন। পবিত্র কোরআন বলছেঃ

"যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি অজ্ঞ হতে পারেন? আর তিনি সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও অবগত ও সচেতন।"

– (সূরা মুল্‌ক, ১১৪)

আল্লাহ কোন দৈহিক সত্তা নন

প্রতিটি দৈহিক সত্তাই স্থান, কাল, গুণ, পরিমাণ ও পরিবেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ এক অসীম সত্তা। তাই তিনি দৈহিক সত্তা হ'তে পারেন না। বস্তুগত সত্তা স্বভাবতঃই বস্তুগত নিয়মনীতির অধীন। অথচ আল্লাহ নিজেই সকল নিয়মকানুনের নিয়ন্ত্রক। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। পৃথিবীতে যেসব রংগীন বস্তুর ছাপ আমাদের চোখের রেটিনায় পড়ে আমরা কেবল সেসবই দেখি। মধ্যাকর্ষণের মত মৌলনীতি আমরা দেখি না কিন্তু উপলব্ধি করি। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা আমরা উপভোগ করি আবার এমন কিছু বিষয় আছে যা আমাদের মন মেজাজকে বিগড়ে দেয়। এসব আনন্দ-উল্লাস, রাগ, শোক ও বিষণ্নতা আমরা দেখি না, কিন্তু উপলব্ধি করি। এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন বস্তুর সংখ্যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর চাইতে কম নয়। সুতরাং অবস্তুগত সেই অসীম অশরীরী মহাসত্তা আল্লাহকে আমরা বস্তুগত চর্মচক্ষু দিয়ে না দেখলেও আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে উপলব্ধি করি। এরই প্রতিফলন ঘটেছে পবিত্র কোরআনে হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে মহান আল্লাহর কথোপকথনেঃ "মুসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হ'ল এবং তাঁর প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখবো', তিনি তখন বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখতে পারবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, উহা যদি স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করল, আর মুসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন বলল, 'মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।"

– (সূরা আরাফ, ১৪৩)

অবস্তুগত হয়েও আল্লাহ কথা বলেন

যখন বলা হয় যে, আল্লাহ মুসা (আঃ)–এর সাথে কথা বলতেন তার অর্থ এ নয় যে, তিনি মুখ, জিহ্বা ও স্বরযন্ত্রের সাহায্যে কথা বলেন। কেননা দেহাবয়ব, মুখ, জিহ্বা ইত্যাদি কোন কিছুই আল্লাহর ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায় না। তবে এর অর্থ এ হতে পারে যে, মুসা (আঃ) তার নিজ হৃদয়ের মধ্যে ওহী উপলব্ধি করেছিলেন। কিংবা আল্লাহ মুসার জন্য শ্রবণ ও গ্রহণযোগ্য করে বাতাসে কণ্ঠস্বরের মত শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ সুকৌশলী সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ কোন যৌগ বা মিশ্রণ নন

প্রতিটি মিশ্রণ অবশ্যই বস্তুজাত এবং অনিবার্যভাবেই তা স্থান ও কালের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু আল্লাহ বস্তুজাত নন। তিনি স্থান কালের গণ্ডিতে ও আবদ্ধ নন। কাজেই তিনি একাধিক মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত কোন যৌগ হতে পারেন না। অধিকন্তু প্রত্যেক মিশ্রণ তার গাঠনিক উপাদানের মুখাপেক্ষী। কারণ মিশ্রণ নিজ উপাদানসমূহেরই ফল মাত্র। অথচ আল্লাহ হলেন সবকিছুর উৎস, কার্যকারণ ও স্রষ্টা এবং তাঁর কোন কিছুরই অভাব নেই। তাহলে কি করে তিনি বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ হবেন, কিংবা হবেন ফলাফল বা গাঠনিক উপাদানের মুখাপেক্ষী?

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান

বস্তুগত পরিমাপের অভ্যাসবশতঃ মানুষের সামনে প্রশ্ন আসে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের অবস্থান কোথায়? অথচ একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, যেহেতু আল্লাহ বস্তুজগতের উর্ধ্বে এক অসীম সত্তা তাই তিনি একই সময়ে কোন সীমাবদ্ধ স্থানে অবস্থান করতে ও অন্যান্য স্থানে অনুপস্থিত থাকতে পারেন না। তাঁর কাছে সকল স্থানই সমান এবং কোন স্থানই তাঁর নিকট অন্য কোন স্থানের চেয়ে অধিকতর নিকটবর্তী বা দূরবর্তী নয়। তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

ভাল ও মন্দের ধারণা

সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ আল্লাহর উপর বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনার পর এ পর্যায়ে আমরা মানবসমাজে ভালমন্দ সম্পর্কে যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব। ভাল ও মন্দের ধারণা মানবসমাজে সর্বকালেই পোষণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল, ভাল ও মন্দ বলে বিভিন্ন কাজকে যে চিহ্নিত করা হয় তা–কি কেবল শরিয়তের হুকুমের কারণেই নাকি মানুষের নিজ বিবেকপ্রসূত? মানুষ তার সাধারণ জ্ঞান থেকেই এর জবাবে বলবে, ভাল ও মন্দ স্ব–স্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই চিহ্নিত হয়।

সত্য নিজের কারণেই ভাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আর মিথ্যা নিজের কারণেই মন্দ হিসেবে চিহ্নিত। কোন কিছু শুধু শরিয়তের বাধ্যবাধকতার জন্যই ভাল বা মন্দ হিসেবে বিবেচিত হয় না। শরিয়তের বিধিনিষেধ থাক বা না থাক ভাল ভালই আর মন্দ মন্দই।

ভালমন্দের বিবেচনা দ্বারাই প্রকৃত সত্যকে খুঁজে নেয়া যায়। ভালমন্দের এই ধারণাকে যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে সত্যকে চেনার মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করা হয়। কেননা মানবসমাজে সঠিক চিন্তার বিকাশ ও শান্তিপূর্ণ মানবিক সমাজব্যবস্থার প্রবক্তা, সংগঠক ও প্রশিক্ষক হলেন নিষ্কলুষ চরিত্রের ঐসব মহামানবগণ যাঁরা ইসলামের পরিভাষায় নবী রাসুল হিসেবে অভিহিত। নবীগণকে মানুষ চিনে থাকে কতকগুলো চিহ্ন বা মুজেযার (এমন নিদর্শন যা সাধারণ মানুষের পক্ষে ঘটানো সম্ভব নয়) মাধ্যমে। আর এক্ষেত্রে আমরা যদি ভালমন্দ চেনার জন্য আক্‌ল্ বা বিবেককে না খাটাই তাহলে নবীদের কখনো চিনতে পারব না। একান্ত অন্ধ অনুকরণকারী ছাড়া স্থান–কাল–পাত্রভেদে আক্‌ল্ বা বিবেকই সত্যকে চেনার উপায় হিসেবে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে অন্য সকল মানদণ্ডই অযৌক্তিক। যদি আক্‌ল্‌কে ভাল–মন্দের পার্থক্যকারী হিসেবে স্বীকার না করা হয় তাহলে এর বাইরে মানুষ ভাল মন্দকে কি দিয়ে পার্থক্য করবে? আক্‌লের ভালমন্দ নির্ধারণ করার ক্ষমতাকে যারা অস্বীকার করে তারা প্রকারান্তরে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তৌহিদের ব্যাপারেও সংশয় সৃষ্টির প্রয়াস পায়। তখন বাস্তব জীবনে খোদাবিমুখতা ও অন্ধ অনুকরণের পথ প্রশস্ত হয়।

মানব প্রবৃত্তি

মানব প্রবৃত্তিতে দু'টো বিপরীতমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একটি হ'ল ফিত্‌রাত (প্রকৃতি) প্রসূত প্রবৃত্তি, যেটি মানবপ্রকৃতির এমন এক প্রবণতা যা মানুষকে প্রকৃতিগত কারণেই ভালর দিকে তথা সত্যের দিকে আকৃষ্ট করে। অপরদিকে নফ্‌সে আম্মারাপ্রসূত প্রবৃত্তি যা মানুষকে মন্দ বা অন্যায় তথা সীমালংঘনের দিকে প্ররোচিত করে।

মানুষ যদি তার বিবেকপ্রসূত চিন্তাভাবনা দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে সে নফ্‌সপ্রসূত প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হতে পারে।

দয়া বা অনুগ্রহ (লুত্‌ফ)

মানুষের নফ্‌সপ্রসূত কুপ্রবৃত্তি দমন করে বিবেকপ্রসূত সুপ্রবণতাকে বিকশিত করতে যা সহায়তা করে, অর্থাৎ যা মানুষকে গুণাহ (মন্দ) থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং সওয়াবের (ভাল) নিকটবর্তী করে সেটিই হ'ল লুত্‌ফ্। যেহেতু মহান আল্লাহ

মানুষকে ভাল-খারাপ দু'টো বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁর (আল্লাহ্‌র) উপর জরুরী হয়ে দাঁড়ায় যে, তিনি মানুষের উপর লুত্‌ফ্‌ করবেন-যতটুকু লুত্‌ফ্‌ করা দরকার। এরপর মানুষ কোন্‌ পথ অবলম্বন করবে তা তার নিজের উপরই নির্ভর করে।

লুত্‌ফ্‌ কখনো আল্লাহর বিশেষ দান হিসেবে আবার কখনো বা বিপদ-মুছিবত রূপে প্রকাশিত হয়। যেমন, আল্লাহ কখনো রোগ-শোক দিয়ে আবার কখনো সুসন্তান ইত্যাদি দিয়ে লুত্‌ফ্‌ করেন। আর আল্লাহ যেহেতু মহাজ্ঞানী ও ন্যায়পরায়ণ এবং আল্লাহ্‌র কাজের একটি সুনির্দিষ্ট ও কল্যাণময় নীতি রয়েছে-তাই নবী পাঠানো তাঁর হিকমাত ও ন্যায়পরায়ণতারই বহিঃপ্রকাশ ও অন্যতম লুত্‌ফ্‌ (অনুগ্রহ)।

"সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রসুল প্রেরণ করেছি-যাতে করে রসুল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

- (সূরা নিসা, ১৬৫)

নবী

নবী হলেন মানুষের অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহর বার্তাবাহক এবং অন্যকোন মানুষের মধ্যস্থতা ছাড়াই যিনি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং-

(ক) নবীকে অবশ্যই 'মানব' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এই শর্তের মাধ্যমে তাঁর ফেরেশ্‌তা বা অন্য কোন সত্তা হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়।

(খ) তাঁকে আল্লাহর বার্তাবাহক হতে হবে। এই শর্তের ভিত্তিতে তাঁর গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তা, যেমন শয়তান ইত্যাদি) বার্তাবাহক হওয়ার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়।

(গ) নবী ও আল্লাহর মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারী না থাকায় ইমাম, ফকীহ্‌, আলেম পর্যায়ের ব্যক্তিগণের পক্ষে নবী হিসেবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

নবী পাঠানোর উদ্দেশ্য

সমগ্র সৃষ্টিজগত, বিশেষ করে মানুষ সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে কল্যাণ দান করে সৌভাগ্যবান করা। পার্থিব জীবন ও পরকাল এই উভয় জগতে মানুষকে কল্যাণ দান করার জন্যই মহান আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

"তোমরা কি মনে করো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে না?"

- (সূরা মুমেনুন, ১১৫)

"আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তা-ই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।"

– (সূরা ছোয়াদ, ২৭)

"আমি জ্বিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"

– (সূরা জারিয়াত, ৫৬)

মানুষের এই ইবাদত মহান আল্লাহর নামে ও তাঁরই উদ্দেশ্যে হ'লেও এই ইবাদতের প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী নন। বরং তা সৃষ্টির কল্যাণ ও সৃষ্টির বিকাশের জন্যই প্রয়োজন। তাই সৃষ্টির কল্যাণ ও বিকাশে ইবাদতের পথ ও পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্যই নবীর প্রয়োজন। সংক্ষেপে এ'টুকু বলা যায় যে,

(১) নবী যদি না আসতো তাহলে মানবিক সমাজব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেতো। মারামারি, কাটাকাটি, সীমালংঘনই তখন বিজয়ী হতো। এটা আল্লাহর হিকমতের পরিপন্থী। তাই আল্লাহর হিকমতে নবুয়্যত অপরিহার্য।

(২) নবীর আগমন দ্বারা মানুষ হেদায়েতপ্রাপ্ত হয় ও পরকালে মহাকল্যাণ ও শান্তির পথ খুঁজে পায়।

নবীগণের দায়িত্ব কি ছিল?

"তিনিই উম্মীদের মধ্য থেকে একজনকে পাঠিয়েছেন রসূলরূপে, যিনি তাদের নিকট আবৃত্তি (পাঠ) করেন তাঁর আয়াত, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত; ইতোপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"

– (সূরা জুময়া, ২)

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নবীকে শুধুমাত্র একজন বার্তাবাহকের সাথে তুলনা করে নবুয়্যতের সার্বিক মিশনকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। যারা এটা করে প্রকারান্তরে তারা আত্মিক পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর প্রকৃত হিকমাত থেকে দূরে সরে গিয়ে চেতনাহীন, কাঠামোসর্বস্ব নীতিমালার আলোকে কোরআনকে নিজ ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করে। এভাবে তারা মুসলমানদের বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ উপরোক্ত আয়াতে রসূলের দায়িত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতের আলোকেই আমাদের চেতনাকে উজ্জীবিত করতে হবে।

তাক্‌দির (ভাগ্য)

তাক্‌দির শব্দটি আরবী কাদ্‌র থেকে উদ্ভূত। কাদ্‌র এর শাব্দিক অর্থ –"পরিমাণ বা পরিমাপ করা।" ইসলামের পরিভাষায় তাক্‌দির শব্দের অর্থ ভাগ্য।

ভাগ্যের ব্যাপারটি নিয়ে যুগ যুগ ধরে মানব সমাজে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠেছে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও আশা-নিরাশার সংঘাত এই বিষয়টি নিয়েই আবর্তিত হয়। তবে ভাগ্য সম্পর্কে প্রধানতঃ দু'টো চরম বা প্রান্তিক মতবাদ মানব সমাজে বিকাশ লাভ করেছে।

এদের একটি হ'ল, মহান আল্লাহ্ মানুষের ভাগ্যকে 'পূর্বনির্ধারিত' করে রেখেছেন। তাই মানুষ ভালমন্দ যাই করুক না কেন বা পৃথিবীতে শান্তি-শৃংখলা বিরাজ করুক কিংবা অশান্তি ও অরাজকতা দেখা দিক, সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। এতে মানুষের কোন হাত নেই। মানুষ এক্ষেত্রে অসহায়, ভাগ্যের হাতের পুতুল। মানুষের পাপ-পূণ্য এবং পরকালে বেহেশ্ত ও দোযখবাসী হওয়ার ব্যাপারটা তারা পুরোপুরি আল্লাহ্র উপর আরোপ করে। প্রধানতঃ রাজা-বাদ্শাহ্ ও জালেম শাসকরা এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এর বিকাশে সহায়তা করে। তাদের ভাড়াটে অনুচররা প্রচার করে বেড়াতো যে, গরীব ও মজলুমদের দুর্দশা তাদের ভাগ্যের লিখন। তাই অদৃষ্টে বিশ্বাস রেখে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করে ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের ভালবাসেন। এভাবে তারা তাক্দিরের অপব্যাখ্যা করে নিজেদের শাসন-শোষণকে মুসলমানদের সত্যাশ্রয়ী নির্ভীক বিদ্রোহের রোষানল থেকে রক্ষা করে।

এই মতবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, কর্মচাঞ্চল্য, কর্মক্ষমতা, আপোষহীনতা ইত্যাদি আল্লাহপ্রদত্ত সৎ ও স্বাধীন গুণাবলীগুলো লোপ পায়। এভাবে তারা সত্যের পক্ষে কথা বলা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত সৎসাহস হারিয়ে ফেলে। এর সূচনা ও বিকাশ ঘটে উমাইয়া বাদ্শাহদের শাসনামলে। এজিদ এই মনগড়া যুক্তি দিয়েই কারবালায় ইমাম হুসেনের শাহাদাতের ঘটনাকে অপব্যাখ্যা করার প্রয়াস পায়।

এই মতবাদের বিপরীতে আর একটি প্রান্তিক মতবাদ হ'ল মানুষ তার কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। মানুষই তার ভাগ্যের একমাত্র সংরক্ষক ও নিয়ন্ত্রক। অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছেন। মানুষ তার নিজের ভাগ্য নিজেই গড়বে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্র কোনরকম হস্তক্ষেপ থাকবে না। এই মতবাদের ধারকগণ নিরংকুশ স্বাধীনতার প্রবক্তা। এর অনিবার্য পরিণতি হ'ল খোদাবিমুখতা তথা পথভ্রষ্টতা। কেননা মানুষ তখন নিজ চিন্তা ও শক্তির উপর মাত্রাতিরিক্তভাবে নির্ভর করার মাধ্যমে বস্তুবাদী ও অহংকারী হয়।

এই উভয় মতবাদের ধারকরাই কোরআনে বর্ণিত বাহ্যতঃ বিপরীতমুখী বিভিন্ন আয়াতকে নিজ নিজ যুক্তির স্বপক্ষে দাঁড় করিয়ে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়। প্রকৃতপক্ষে দু'টি মতবাদই চরমপন্থী, প্রান্তিক ও ভ্রান্ত। এবার এই

দু'ধরনের আয়াতগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক এগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা কি।

যারা মানুষের সব ভাল ও মন্দকাজের দায়দায়িত্ব মহান আল্লাহ্‌র উপর চাপিয়ে থাকে তারা নিম্নোক্ত আয়াতগুলোকে নিজেদের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করে।

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে উহা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি পূর্বেই লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা খুবই সহজ।"

– (সূরা হাদীদ, ২২)।

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই হাতে রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত; তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয়না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।"

– (সূরা আনআম, ৫৯)।

"আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"

(সূরা ইবরাহীম, ৪)।

"বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্ ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হ'তে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমা হতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

– (সূরা আলে ইমরান, ২৬)।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট হয় অর্থাৎ এগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা হ'লআল্লাহ সীমাহীনমর্যাদার অধিকারী ও সুনিয়ন্ত্রক। আল্লাহ্‌র জ্ঞান অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সর্বব্যাপী। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তাই তিনি ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে সবই জানেন। কোনকিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকে না।

সর্বযুগে কখন কি ঘটবে তা আল্লাহ্‌র কাছে পূর্বেই লিপিবদ্ধ আছে। তবে সবকিছুই আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত নয়। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ই সব কাজ করতে মানুষকে বাধ্য করবেন না। বরং মানুষকে যে স্বাধীনতা দেয়া আছে, তার দ্বারাই সে বেছে নেবে যে, সে কোন পথ অবলম্বন করবে। এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ তাঁর অসীম জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে জানা বিষয়গুলোকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন মাত্র। অতঃপর কে চূড়ান্তভাবে ভালপথে যাবে আর কে ভুলপথে যাবে অর্থাৎ কে দোযখী হবে আর কে বেহেশতী হবে সে ব্যাপারে আল্লাহ্ হস্তক্ষেপ করেন না। তা না হ'লে তাঁর ন্যায়বিচারক হওয়ার ব্যাপারটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর আলোকে আল্লাহ্‌র সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার মানে এই নয় যে, আল্লাহ্ অবিবেচকের মত অন্যায়ভাবে (নাউজুবিল্লাহ) যা খুশী তাই করেন। বরং সৃষ্টির উপর আল্লাহ্ তাঁর অসীম ক্ষমতার প্রয়োগ কিভাবে করেন তার নীতিমালা কুরআনের বিভিন্নস্থানে চমৎকারভাবে বর্ণিত আছে। সেই আয়াতগুলোকে উপরোক্ত আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যারা তাক্‌দিরের ব্যাপারে নিরংকুশ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তারা নিম্নোক্ত আয়াতগুলোকে নিজেদের মতের স্বপক্ষে বর্ণনা করে থাকেন।

"আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন না করে।"

– (সূরা রাদ, ১১)।

"আল্লাহ্ উদাহরণ দিয়েছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। সেখানে সবদিক থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করল; ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ তাদের ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করান।"

– (সূরা নাহল, ১১২)।

"আল্লাহ্ তাদের উপর কোন জুলুম করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছিল।"

– (সূরা আনকাবুত, ৪০)।

"যে সৎকাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেউ মন্দকাজ করলে উহার প্রতিদান সে–ই ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তার বান্দাদের উপর কোন জুলুম করেন না।"

– (সূরা হামীম আস্–সাজদাহ, ৪৬)।

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে।"

– (সূরা রুম, ৪১)।

এ ধরনের আয়াত থেকে আমরা যা সহজেই বুঝতে পারি, অর্থাৎ এগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা হ'ল, আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও একইসাথে তিনি ন্যায়পরায়ণও বটে। কাজেই আল্লাহ ন্যায়নীতির ভিত্তিতে কর্মপরিচালনা করেন। তিনি কারও উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। তিনি মানুষকে কল্যাণ দিতে চান। ভালপথের পথিকরা সৌভাগ্যবান আর মন্দপথের পথিকরা দুর্ভাগ্যের অধিকারী হয়। আর সে নিজেই নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়ী। ভালপথ বেছে নিয়ে সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, যদিও ভুলপথে যাওয়ার তার সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। অবশ্য ভাল কাজ করতে তাকে কেউ

বাধ্য করেনি। তেমনি মন্দ কাজ করে সে তিরস্কৃত হয় এবং এই মন্দকাজ করতে কেউ তাকে বাধ্য করেনি।

আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি দিয়েই মানুষ ভাল বা মন্দ কাজ করে থাকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র শক্তি ছাড়া তার কোনকিছুই করার ক্ষমতা নেই)। কিন্তু "আল্লাহ্র ইচ্ছায় সে ভাল বা মন্দ কাজ করে থাকে অথবা আল্লাহ্ সবকিছু পূর্বনির্ধারিত করে রেখেছেন" এটা আদৌ ঠিক নয়, যা উপরোক্ত দু'ধরনের আয়াত মিলিয়ে পড়লেই বুঝা যায়।

আল্লাহ্ মানুষকে ভালমন্দ বুঝার জ্ঞান (আক্ল) এবং নবী-রাসূল ও কিতাব দান করেছেন। মাঝে মাঝে বিপদ-আপদ ইত্যাদি দ্বারাও তাকে সচেতন করার সব পথ অবলম্বন করেছেন (যেহেতু তিনি অসীম দয়ালু)। তার পরও কেউ উপর্যুপরি সীমালংঘন করলে এবং করতে চাইলে তাকে তা করার সুযোগ দেন। কারণ পৃথিবীর এই পরীক্ষাক্ষেত্রে এটুকু স্বাধীনতা তিনি সব মানুষকেই দান করেছেন যেমনিভাবে পরীক্ষক পরীক্ষার হলে ছাত্রকে ভুল শুদ্ধ সবই লিখার সুযোগ দেন। তবে এই সুযোগদান প্রক্রিয়া একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত চলতে পারে। অতঃপর সেই চূড়ান্ত সীমা লংঘিত হ'লে তাকে আর সুযোগ দেয়া হয়না, তার হেদায়েতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এরই প্রতিফলন ঘটেছে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে-

"আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করে দিয়েছেন। তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"

– (সূরা বাকারা, ৭)।

চূড়ান্তভাবে এই পৃথিবীর সব কৃতকর্মের প্রতিদান তিনি দান করবেন – এটাই আল্লাহ্র হিকমাত ও ন্যায়বিচার।

তাক্দিরের সঠিক ব্যাখ্যা

উপরোক্ত দু'ধরনের আয়াত পাশাপাশি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে আমরা তাক্দিরের সঠিক অবস্থান জানতে চেষ্টা করেছি। তবে তাক্দির সম্পর্কে কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ইমাম জাফর সাদিকের নিম্নোক্ত কথায়ঃ

"পুরোপুরি বাধ্যবাধকতা নয়, আবার পুরো স্বাধীনতাও নয়, বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি একটি পথ।"

প্রকৃতির নিয়মের অধীন এ পৃথিবীতে মানুষ তার কর্মক্ষেত্রে কোন্ পথ বেছে নেবে, এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

বিষবৃক্ষের বীজ থেকে বিষবৃক্ষই জন্ম নেয়। আবার আমের বীজ থেকে আমগাছই অংকুরিত হয়। কিন্তু আল্লাহ্র শক্তি ছাড়া অন্য কারো শক্তিতে একটি বীজও অংকুরিত হয় না। এটা মানুষের ইচ্ছাধীন যে সে বিষবৃক্ষ বপন করবে,

না আম গাছের বীজ বপন করবে। এটাই মানুষের স্বাধীনতা। তাই সে বিষবৃক্ষ লাগিয়ে বা অপকর্ম করে যদি বলে, আল্লাহই এটা করিয়েছেন তাহলে তা প্রকৃত ঘটনার অপব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই নয়। অনুরূপভাবে ঔষধ দ্বারা রোগ ভাল হওয়ার উদাহরণও দেয়া যেতে পারে। সঠিক ঔষধ সেবন করলে রোগ সেরে যায় এবং ভুল ঔষধ সেবন করলে রোগ সারেনা। এ বিষয়টিও তাক্‌দিরের অন্তর্ভুক্ত।

রসুল (সাঃ) ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরীগণ স্পষ্টভাষায় বলেছেন, সবকিছুই আল্লাহ্‌র নির্দেশে সংঘটিত হয়। কিন্তু একই সময় এটাও বলেছেন যে, মানুষই হচ্ছে তার ভাগ্য নির্ধারণের সক্রিয় কারণ। কোন পথে চলার সময় একটি চৌরাস্তা বা তেমাথায় পৌঁছে যেমন যেকোন একটি পথ বেছে নিয়ে চলা যায়, তেমনি মানুষের ভাল বা মন্দপথ বেছে নেয়ার উপর তার ভাগ্যের ভালমন্দ নির্ভর করে। কিন্তু চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্‌র শক্তিছাড়া সে কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারে না।

মানুষ ইচ্ছা ও কর্মে স্বাধীন। তবে এর পাশাপাশি আল্লাহ্‌ তার জীবনধারায় মাঝে মধ্যে হস্তক্ষেপ করে থাকেন এবং তা মানুষের কল্যাণের জন্যই। যেমন, কোন ব্যক্তির বহু চেষ্টা করেও ধনী হতে না পারা। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির চূড়ান্ত কল্যাণের জন্য ধনী হওয়ার চেয়ে গরীব হয়ে থাকাই সহজ ও কল্যাণকর বলে আল্লাহ্‌ হয়তো তাকে দরিদ্র করে রাখেন। তেমনিভাবে কেহ কেহ বহু চেষ্টা করেও পৃথিবীতে ক্ষমতাশালী হ'তে পারে না। এক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমতাহীন করে রাখেন। কেননা ক্ষমতালাভ তার জন্য ক্ষতিকর। আবার কখনো কোন জালেমের অব্যাহত সীমালংঘনে আল্লাহ বাধা দেন ও পৃথিবীতে তাকে কিছুটা শাস্তি দেন। কাউকে ধনী হ'তে না দেয়া, ক্ষমতাসীন না করা বা জালেমকে পৃথিবীতে সাময়িক শাস্তিদানের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাদের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাদের উপর অনুগ্রহ (লুত্‌ফ্‌) করেন। এক্ষেত্রে দরিদ্র ব্যক্তিটির পাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, অধিকতর খোদামুখী হওয়ার সুযোগ আসে এবং পরকালের জীবনে পুরস্কার পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। তেমনি অত্যাচারী লোকটি পৃথিবীতে কিছুটা শাস্তি পেলে তার পরকালের শাস্তির বোঝা কিছুটা কমে আসে। পাশাপাশি মানবজাতির সামনে আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের একটি নিদর্শন স্থাপিত হয়। মানুষ অনুধাবন করতে পারে যে আল্লাহ্‌ সমস্ত ন্যায়–অন্যায়ের হিসেব নেবেন ও প্রতিদান দেবেন।

এ প্রসংগে আর একটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেয়া দরকার। মহান আল্লাহ চূড়ান্ত বিচারের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের যোগ্যতা ও প্রেক্ষাপট সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। সেক্ষেত্রে ন্যায় বা অন্যায়ের পথে চলার বিষয়টিই প্রধান বিবেচ্য। তাই কারও ধনী বা দরিদ্র হওয়াটা কোন মৌলিক বিষয় নয়। ধনী ব্যক্তিকে তার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এবং দরিদ্রকেও তার নিজের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। "পুরোপুরি

বাধ্যবাধকতা নয়, আবার পুরো স্বাধীনতাও নয় বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি একটি পথ" ইমাম জাফর সাদিকের এ বাণীতে উপরোক্ত বিষয়টিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র বিশেষ হস্তক্ষেপ

সৃষ্টির সাধারণ নিয়মের বাইরে কখনো কখনো অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে থাকে। এগুলোর পেছনে থাকে আধ্যাত্মিক কারণ। এ অবস্থাটা তখনই হয় যখন আধ্যাত্মিক কারণটি পৃথিবীর সাধারণ বস্তুগত বা প্রাকৃতিক কারণটিকে ম্লান করে দেয়। তখন "সকল ফলাফলের পেছনেই কারণ বর্তমান" বস্তুগত এই সূত্র অনুসারে ঘটনা না ঘটে আধ্যাত্মিক কারণে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে থাকে।

কোরআন মজিদে বর্ণিত বদরের যুদ্ধের ঘটনাটির কথাই ধারা যাক্।

"স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলে, তখন তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে তাদের স্বল্পসংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তাদের দৃষ্টিতে তোমাদের অধিক সংখ্যক দেখিয়েছিলেন যা ঘটার ছিল তা সম্পন্ন করার জন্য। সকল বিষয়ই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।"

– (সূরা আনফাল, ৪৪)।

এভাবে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ কোন একটা জাতিকে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চমানের জন্য বস্তুগতভাবে অপেক্ষাকৃত হীনবল হওয়া সত্ত্বেও অন্যদলের উপর বিশেষ অবস্থায় বিজয় দান করেন।

পক্ষান্তরে চরম সীমালংঘনকারীদের কঠোর শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র বিশেষ হস্তক্ষেপ ঘটে। ফিরআউনের সদলবলে সমুদ্রগর্ভে ডুবে মরা, ক্ষুদ্র আবাবীল পাখির নিক্ষিপ্ত কংকর দ্বারা আবরাহার হস্তিবাহিনীর ধ্বংসসাধন এরই উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থ সহায়িকা

* আলবাব-আলহাদী আশার - আল্লামা হিল্লী (রহঃ)
* উসুল-আল ফেক্‌হ - রেজা মোজাফফর
* আল্লাহকে জানা - শহীদ হুজ্জাতুল ইসলাম ডঃ জাভেদ বাহোনার
* LESSONS FROM QUR'AN-HUJJATUL ISLAM MUHSIN QARA'ATI.
* MEN AND HIS DESTINY-SHAHID DR. AYATOLLAH MURTAZA MUTAHHARI.

প্রাপ্তিস্থান

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র
৫-সি, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ
ঢাকা-১০০০

ইউনিভারসিটি বুক ডিপো
১৮৭, ঢাকা নিউ মার্কেট
ঢাকা-১২০৫

শিরিন বই ঘর
১/১, নীলক্ষেত মার্কেট
ঢাকা-১২০৫

আধুনিক বই সাগর
৭১/১, মালিবাগ ডি, আই, টি, রোড
মৌচাকস্থ রামপুরা বাস স্ট্যাণ্ড
ঢাকা-১২১৭

নিউ বই মেলা
১২১৯/১৫, সি
খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯

আল্ ইক্‌রা বই ঘর
নাছির সুপার মার্কেট
চান্দনা (চৌরাস্তা), গাজীপুর

মেসার্স জলিল প্রসাধনী
ও বই বিতান
আমিন ভবন, চেরাগ আলী মার্কেট
টঙ্গী, গাজীপুর

সিন্দাবাদ প্রকাশনী
বায়তুল মোকাররম,
ঢাকা

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
৪, দুর্গাবাড়ী রোড,
ময়মনসিংহ

সম্রাট লাইব্রেরী
হাজী আফসারউদ্দিন রোড
ধানমণ্ডি-১৫,
ঢাকা-১২০৯

আল—এছহাক প্রকাশনী
২/৩, প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার,ঢাকা।